প্রথম আলো

তারিখ 17 JUL 2017
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মামলা

বি শ্ব বি দ্যা ল য় প্র শা স ন

আনু মুহাম্মদ

কয়েক দশকের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থেকে আমি সব সময়ই এটা উপলব্ধি করি যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক হলো বুদ্ধিবৃত্তিক গঠন ও অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় এক যৌথ যাত্রা। অন্য যেকোনো সম্পর্কের থেকে এটি আলাদা। পরস্পরের প্রতি দায়, পরস্পরের প্রতি ঋণ, পরস্পরের ওপর নির্ভরতার মধ্যেই এই সম্পর্ক স্থায়ী রূপ নেয়। এই সম্পর্ক তাই প্রতিষ্ঠানেই শেষ হয় না, এর স্থায়িত্ব থাকে আজীবন। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এর গুণগত মাত্রা আরও বিশিষ্ট। এখানে শিক্ষার্থীরা সবাই সাবালক, ভোটার বয়সী মানে রাষ্ট্রীয় বিধান অনুযায়ী তাঁরা রাষ্ট্র পরিচালক নির্বাচনের ক্ষমতা রাখেন। সুতরাং এখানে যৌথ যাত্রা-আরও পরিণত। এই যাত্রায় শিক্ষার্থীদের নিজস্ব মতপ্রকাশ, প্রশ্ন উত্থাপন, ভিন্নমত তাই অপরিহার্য।

একজন প্রকৃত শিক্ষক সব সময়ই চাইবেন শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন করুক। প্রশ্ন করতে গেলেও পড়তে হয়, প্রশ্ন করতে গেলে চিন্তা করতে হয়, বিশ্লেষণী ক্ষমতা অর্জন করতে হয়, নিজস্ব অবস্থান তৈরি করতে হয়। সুতরাং প্রশ্ন করা অবশ্যই শিক্ষার অপরিহার্য অংশ। প্রশ্ন করা বা শিক্ষকের সঙ্গে মতভেদ প্রকাশকে বেয়াদবি হিসেবে দেখা ঠিক নয়, বরং যোগ্যতা হিসেবেই আমাদের উৎসাহিত করা উচিত। কিন্তু এটাও জানি, বর্তমানে ক্লাসে এবং বাইরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রশ্ন করার অভ্যাস ও সাহস দুটোই কম। আমাদের সমাজে ছোটবেলা থেকেই গড়ে তোলা হয় নির্দেশমতো চলা ও চিন্তা করার ধাঁচে। ক্ষমতার প্রতি প্রশ্নহীন বিশ্বাসের গণ্ডি পার হয়ে প্রশ্ন করাকে কিংবা প্রতিষ্ঠিত মতের সঙ্গে বিতর্ককে অনেক অভিভাবক, শিক্ষক ঔদ্ধত্য ও বেয়াদবি বলে মনে করেন। এ রকম প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন করতে ভুলে যায়। প্রশ্ন করতে ভয় পায়। সৃজনশীলতা, চিন্তা করার ক্ষমতা পরাজিত হয়। শিক্ষার্থীরা যদি প্রশ্ন না করে, যদি বিতর্ক না করে, তাহলে শিক্ষকেরই বা বিকাশ হবে কীভাবে? শিক্ষার তাহলে কী থাকে? এখন তো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদেরই প্রশ্ন করা মানা!

শিক্ষক যদি প্রকৃতই শিক্ষক হন, আর শিক্ষার্থী যদি হন প্রকৃত শিক্ষার্থী, তাহলে দুপক্ষের সম্পর্কের মধ্যে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু শিক্ষক যদি হন শিক্ষাবণিক বা আমলা বা পুলিশ, যদি হন সরকারের প্রতিনিধি, তাহলে তো সমস্যা হওয়ারই কথা। একইভাবে সমস্যা তৈরি হয় যদি শিক্ষার্থী কোনো বস-বড় ভাই বা ওস্তাদের প্রতিনিধি, অর্থ-সুবিধাসন্ধানী বা সন্ত্রাসী হিসেবে আবির্ভূত হয়। যেসব সমস্যা-সংকট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করে, তার কারণ অনুসন্ধান করলে এই ধরনের কোনো না কোনো চিত্র পাওয়া যাবে।

২৬ মে ভোরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের মহাসড়কে এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই দুজন শিক্ষার্থী বাসের ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়ে বেশ কিছু সময় রাস্তাতেই পড়ে থাকেন এবং পরে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর একে একে এমন সব ঘটনা ঘটতে থাকে যার ধারাবাহিকতায় বিশ্ববিদ্যালয় এখনো অশান্তির মধ্যে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াতের পথে এই প্রতিষ্ঠানের কারও নিহত হওয়া শিক্ষক-শিক্ষার্থী সবার জন্যই বেদনা ও ক্ষোভের কারণ। কারণ, এসব সড়ক দুর্ঘটনা নিছক দুর্ঘটনা নয়, এর সঙ্গে সড়ক ব্যবস্থাপনা, বাঁক, চালকদের অবস্থা ও ভূমিকা ইত্যাদি সম্পর্কিত। এর সঙ্গে যদি উদ্ধার বা চিকিৎসায় অবহেলা থাকে, তাহলে ক্ষোভ বাড়বেই।

এর আগেও এই এলাকায় বিভিন্ন সময়ে বেশ কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। প্রতিকারের ব্যবস্থা হয়নি। সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশই ঘটেছে সেদিন সড়ক অবরোধের মধ্যে। এর ওপর ওই নিহত শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে জানাজা পড়তে দেওয়া হয়নি। কেন জানাজা পড়তে দেওয়া হলো না, তার কারণ বুঝতে পারি না। এই না দেওয়ায় ক্ষোভ তখন আরও বেড়েছে। শিক্ষার্থীরা সড়ক অবরোধে থাকাকালে সরকারি ছাত্রসংগঠন তাঁদের ওপর হামলা করেছে। উপাচার্যের হস্তক্ষেপে এবং তিনি শিক্ষার্থীদের দাবি মেনে নিলে যখন শিক্ষার্থীরা সড়ক অবরোধ ছেড়ে দিতে যাচ্ছেন, সে সময়ই পুলিশ আক্রমণ চালিয়েছে তাঁদের ওপর। লাঠি, টিয়ার গ্যাস শেল, রাবার বুলেটে আক্রান্ত হন শিক্ষার্থীসহ আশপাশের অনেক মানুষ। মহাসড়ক ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে তখন আহত-রক্তাক্ত শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের আর্তনাদ তৈরি হয়। ক্ষোভ আরও বিস্তৃত হয়।

শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের হামলা

এ রকম আক্রমণের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা উপাচার্যের বাসভবনে গেছেন প্রতিবাদ জানাতে। একটি অংশ উপাচার্যের ভবনের ভেতর ঢুকেছে। ক্ষোভ ও অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেছে। অশোভন বাক্য ও ভাঙচুরের অভিযোগও আছে তাদের বিরুদ্ধে। এর প্রতিক্রিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অনির্দিষ্টকালের জন্য হল বন্ধ ঘোষণা করেছে। আকস্মিকভাবে হল ছাড়তে বাধ্য হয়ে শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি বেড়েছে। উপাচার্য পুলিশ ডেকে তাদের হাতে শিক্ষার্থীদের তুলে দিয়েছেন। ১২ জন নারী শিক্ষার্থীসহ ৪২ জনকে উপাচার্যের বাসভবন থেকে সাদা মাইক্রোবাসে করে পুলিশ তুলে নিয়ে গেছে। তাঁদের থানায় নিয়ে হয়রানি করা হয়েছে। আহত অবস্থায় হাসপাতালেও হাতকড়া পরিয়ে রাখা হয়েছে। গ্রেপ্তার ছাড়াও অজ্ঞাতনামা আরও ৪০-৫০ জনের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় মামলা করেছে। সেই মামলার শুনানি হয়েছে ৪ জুলাই। শুনানিতে অংশগ্রহণের জন্য ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস রিকুইজিশন দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় তা অনুমোদনও করেছে। কিন্তু ঠিক আগের দিন রাতে সেই অনুমোদন বাতিল করা হয়েছে।

এই যে ঘটনাগুলোর বিবরণ দিলাম, এর কোনটি আমাদের কাঙ্ক্ষিত? শিক্ষার্থীর অকালমৃত্যু নয়, প্রশাসনের নির্দয় ও সংবেদনহীন আচরণ নয়, শিক্ষার্থীদের ওপর সরকারি দল ও পুলিশের হামলা নয়, সড়ক অবরোধ নয়, উপাচার্যের বাসভবনে প্রবেশ নয়, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পরস্পরের সঙ্গে দুর্ব্যবহার নয়। এতগুলো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য কাকে বা কাদের দায়ী করতে পারি আমরা?

সড়ক অবরোধ করে শিক্ষার্থীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। যুক্তির দিক থেকে দেখলে এটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এতে অনেক মানুষের ভোগান্তি হয়, যাদের কোনো অপরাধ নেই। আমরা সবাই এ রকম অবরোধের ভুক্তভোগী। যাঁরা অবরোধ করেছেন, তাঁরা বা তাঁদের অভিভাবকেরাও নিশ্চয়ই এর ভুক্তভোগী। কিন্তু দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সড়ক দুর্ঘটনায় সতীর্থ, সহকর্মী বা স্বজন নিহত হলে কেন মর্মাহত, ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থী, শ্রমিক, এলাকাবাসী গিয়ে সড়ক অবরোধ করেন? করেন এই কারণে যে প্রতিবাদের আর কোনো পথ এ দেশে কাজ করে না। কোনো সমাধানের রাস্তা বের করতে কিংবা অপরাধীদের শায়েস্তা করতে কর্তৃপক্ষের কেন সব সময় অনীহা থাকে, কেন ব্যবস্থা নিতে দেরি হয়, এটা একটা বড় প্রশ্ন। সেটা হয় না বলে অশান্তির জন্ম হয়। অবরোধ-বিক্ষোভের মাধ্যমে মানুষ তাদের প্রতিবাদের পথ খোঁজে। জাহাঙ্গীরনগরেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

সমাধানের বদলে এক দফা সরকারি ছাত্রসংগঠন এবং তারপর পুলিশের আক্রমণে বিপর্যস্ত শিক্ষার্থীরা উপাচার্যের বাসভবনে গিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছেন, কর্তৃপক্ষের বিবরণীতে জানা যায় যে তাঁরা অশোভন ভাষায় চিৎকার করেছেন, ভাঙচুর করেছেন। উপাচার্যের বাসভবনের ভেতরের বাগানে প্রবেশ, গালিগালাজ, ভাঙচুর কোনোটিই গ্রহণযোগ্য নয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে আমি এর জন্য অনুতাপ দেখেছি, অনেকে বলেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্তর্ঘাতকারী ঢুকেছিল। কিন্তু নিজস্ব বিচার-প্রক্রিয়া ছেড়ে পুলিশ ও মামলার পথে যাওয়া কি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মানানসই ছিল? বিস্ময়কর হলো কর্তৃপক্ষ যে মামলা করেছে, সেখানে এমন অনেক শিক্ষার্থীর নাম আছে, যাঁরা সে সময় ওখানে উপস্থিতই ছিলেন না, কয়েকজন আগেই পুলিশি আক্রমণে আহত হয়ে হাসপাতালে ছিলেন। কেউ কেউ বাড়িতে ছিলেন। উপাচার্যের বাসভবনে অনুপস্থিত থাকলেও তাঁদের কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে হলে সন্ত্রাস, বেতন-ফি বৃদ্ধি, যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকায় পরিচিত। অনেকের ধারণা, সে জন্যই তাঁদের নামও মামলায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি নিশ্চয়ই প্রশাসনের বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা কমায়।

বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থী আর সন্ত্রাসী এক নয়। সন্ত্রাসী আর বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থী, আক্রমণকারীর রোষ আর আক্রান্তদের প্রতিবাদ এক করে দেখা যায় না। না দেখা গেলে এভাবে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের সন্ত্রাসী হিসেবে মামলা দেওয়া, হয়রানি করা যায় না। আমরা সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতির কথা জানি। শিক্ষার্থীদের মুখে শুনি, হলে হলে তাঁদের কত চাপের মধ্যে থাকতে হয়, কখনো জোর করে সভা-সমাবেশে অংশগ্রহণে বাধ্য করা আবার কখনো কোথাও অংশগ্রহণে বাধা দেওয়া। হলে সরকারি ছাত্রসংগঠনের ক্ষমতাচর্চায় অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকদের প্রশাসনও অকার্যকর। নানা স্থানে চাঁদাবাজি, যৌন হয়রানি, মারপিট ইত্যাদি অভিযোগ প্রায় সময়ই। অনেক শিক্ষার্থী এখন হলে থাকার চেয়ে নানা স্থানে মেস করে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। এই অবস্থার পরিবর্তন এবং একটি গণতান্ত্রিক, সহনশীল, নিরাপদ, শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টিই তো প্রশাসনের মূল দায়িত্ব। সে ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকলে বা উল্টো ভূমিকা থাকলে তো অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা তৈরি হবেই।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে অনুরোধ করি, শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে করা মামলা প্রত্যাহার করে পুরো ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা নেওয়া হোক, তাহলেই পুরো চিত্র পাওয়া যাবে। তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের যুক্ত করে তা ব্যাপক আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসা হোক। এর মধ্য দিয়েই অঘটনের কারণ এবং প্রতিকার বের হবে; পুলিশ, মামলা, হামলা, হুমকি, বিদ্বেষ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ ভালো করা যায় না। এ ছাড়া এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে জাকসু নির্বাচনের উদ্যোগ নেওয়াও খুব জরুরি। ছাত্র সংসদ নির্বাচন হোক, এসব অনেক ঝামেলা থেকে তখন বেঁচে যাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। যদি যথাযথভাবে নির্বাচন হয়, ছাত্রছাত্রীরা ভোট দিতে পারেন, তাহলে তারাই শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ-দাবির প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তো শিক্ষকেরাই পরিচালনা করেন। সবার ওপরে তো তাঁরা শিক্ষক, প্রশাসক নন। শিক্ষক হিসেবে শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষার্থীদের স্বার্থ, সন্ত্রাস-দুর্নীতি-নিপীড়ন-বৈষম্য থেকে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলায় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাঁদের ঐক্যই প্রধান হওয়ার কথা, সংঘাত নয়।

● **আনু মুহাম্মদ: অর্থনীতিবিদ ও অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।**
anu@juniv.edu